3. কৃষি উৎপাদনশীলতা (Agricultural productivity) :- কৃষি ভূগোলে কৃষি অঞ্চল নির্ণয়ে কৃষি উৎপাদনশীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য্য বিষয়। কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে কৃষি উৎপাদনশীলতা নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত।

কৃষি উৎপাদনশীলতা বলতে উৎপাদনের পরিমাপ এবং কৃষিতে নিযুক্ত উপাদান ও তার থেকে প্রাপ্ত উৎপাদনকে বোঝায়। অন্যথায় বলা যায় কৃষি উৎপাদনশীলতা বলতে বিনিয়োগ-উৎপাদন অনুপাত (input-ontput ratio) বোঝায়।

কোন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অঞ্চলের কৃষি উৎপাদনশীলতা মূলত ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক (ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, জল), আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রতিষ্ঠানিক, সাংগাঠনিক নিয়ন্ত্রক দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং কৃষি উৎপদনশীলতা হল প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সম্মিলিত ফলাফল। হেক্টর প্রতি উৎপাদনশীলতা ও মোট উৎপাদনের পরিমাণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতাকে প্রকাশ করা যায়।

কৃষি উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে কোন অঞ্চলের সাথে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কার্যকরিতা সম্পর্কে তুলনা করা যায়। কৃষি উৎপাদনশীলতার বিচারে কোন অঞ্চলকে স্বল্প, মাঝারী, ও উচ্চ এই তিনভাগে ভাগ করে যথাসম্ভব আঞ্চলিক অসাম্যতা দূর করার জন্য কৃষি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনা এটা ঠিক করে দেয় যে ভূমির বাস্তব অবস্থা কোন অঞ্চলের কৃষিকাজের পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ।

ভারতের মত বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দ্রুত জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে কৃষি পণ্যের যে চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে তা সামাল দিতে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা দরকার সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভারতের কৃষি বিজ্ঞানী ও কৃষকগণ বেশীর ভাগ রাজ্যেই কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির চেষ্টায় নিয়ত বিভিন্ন গবেষণা করে চলেছে। আর তারই ফলশ্রুতিতে যে সমস্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলি হল —

i) উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার। ii) সম্পদের নিবিড়ভাবে ব্যবহারের জন্য জলসেচ সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন। iii) বিভিন্ন প্রকার সারের যথোপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহার। iv) বিভিন্ন ক্ষতিকর জীবানুকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি। v) বহুফসলী শস্যাবর্তন যুক্ত চাষাবাদ। vi) কৃষি পরিষেবা পরিকাঠামোর উন্নয়ন। vii) মৃত্তিকা ও জলের ব্যবস্থাপনা এবং মৃত্তিকা ও জলের সংরক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ। viii) কৃষকদের প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার জন্য কৃষিকাজ সম্প্রসারিত কর্মসূচী (Agricultural extension programmes)। ix) গবেষণার উপরে অধিক গুরুত্ব এবং তার প্রয়োগ। x) উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহারের কর্মসূচী। xi) কৃষি এলাকার নিবিড় কর্মসূচী। xii) নিবিড় কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প বা জেলা কর্মসূচী। xiii) খরা প্রবণ এলাকার উন্নয়ন কর্মসূচী। xiv) শুষ্ক কৃষি ব্যবস্থার সম্প্রসারিত কর্মসূচী।

■ **কৃষি উৎপাদনশীলতার পরিমাপ (Measurement of Agricultural productivity) :-** প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী ভৌগোলিকগণ ও অর্থনীতিবিদ্‌গণ কৃষি উৎপাদনশীলতা নির্ণয়ে শ্রম, মূলধন এবং কৃষি পণ্য উৎপাদনের

ব্যয়কে বিবেচনা করেন। কিন্তু বর্তমানে কৃষি উৎপাদনশীলতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মৃত্তিকার ধারণযোগ্যতা, বাস্তুতন্ত্রের অবস্থা এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার বিষয়গুলি ক্রমশঃ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বর্তমান শতাব্দীতে ভৌগোলিক ও অর্থনীতিবিদরা কৃষি উৎপাদনশীলতা নির্ণয়ে কয়েকটি পদ্ধতির ধারণা প্রদান করেন। প্রতি একক অঞ্চলে (Per unit area), প্রতি সময়ের এককে (Per unit of time) কৃষি উৎপাদনশীলতা নির্ণয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হল —

i) **প্রতি একক অঞ্চলে কৃষিপণ্য উৎপাদনের মূল্যমান** নির্ণয়ের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতা নির্ণয় করা হয়।

ii) **ফার্মের শ্রমিকের প্রতি একক উৎপাদন।** (Measuring production per unit of farm labour)

iii) **আউটপুট-ইনপুট অনুপাত ঃ-** আউটপুট-ইনপুট অনুপাত নির্ণয়ের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতা নির্ণয় করা যায় মূলত জীবিকাসত্ত্বাভিত্তিক অর্থনীতিতে, যেখানে —

ক) খাদ্যশস্য চাষের প্রাধান্য বেশী এবং মোট কৃষি পণ্যের 75% থেকে 85% ই খাদ্যশস্য।

খ) কৃষি থেকে প্রাপ্ত শস্যের সবটুকুই নিজের ভোগে ব্যবহৃত হয়।

গ) কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত ইনপুটগুলির ব্যবস্থা কৃষক নিজেই করে থাকে।

✪ **Khusro কৃষিক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটির প্রয়োগ একটু পরিবর্তিতভাবে ঘটান।**

iv) **জন প্রতি grain equivalents**-এর পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি পণ্যের উৎপাদন প্রকাশ করার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতা নির্ণয় করা যায়। এই পদ্ধতি প্রথম 1967 সালে Buck ব্যবহার করেন। তিনি এক কিলোগ্রাম কৃষিপণ্যকে grain equivalent -এ রূপান্তরিত করেন। কৃষিকাজের অগ্রগতি পরিমাপের ক্ষেত্রে Buck কর্তৃক প্রবর্তিত grain equivalent পদ্ধতি E.de Vrie একটু পরিবর্তিত আকারে প্রকাশ করেন। তিনি এশিয়ার দেশগুলিতে দানাশস্যের সকল আউটপুটকে মোট জনসংখ্যা প্রতি 'Milled-rice equivalents' -এর আকারে প্রকাশ করেন। Clark ও Haswell একইভাবে কৃষি উৎপাদনশীলতাকে জন প্রতি Wheat equivalent-এর আকারে প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে কৃষিপণ্যের উৎপাদন কিলোগ্রামে পরিমাপ করা হয়।

আবার Jasbir Singh এবং Sharma উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিবর্তিত আকারে প্রকাশ করেন। তিনি 'শ্রম উৎপাদনশীলতা' কথাটি ব্যবহার করেন এবং একে মোট কৃষিপন্যের উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেন। কৃষিপণ্যের উৎপাদন 'Conventional grain unit-এ পরিমাপ করেন। একটি 'Conventional grain unit' বলতে 100 কেজি গমের উৎপাদনকে বোঝায়।

v) **Rankig co-efficient method :-** Kendall কৃষি উৎপাদনশীলতা নির্ণয়ে ranking co-efficient' পদ্ধতিটির প্রয়োগ করেন। এই পদ্ধতিটি সরল এবং সহজেই প্রয়োগ করা যায়। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক ক্ষেত্রীয় এককে প্রতি হেক্টর পিছু বিভিন্ন শস্যের উৎপাদন অনুসারে ক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়। তারপর প্রতি একক ক্রমসমূহের গাণিতিক গড় নির্ণয় করা হয়। একেই ranking co-efficient বলে। এই পদ্ধতিটি নিম্নলিখিত আকারে প্রকাশ করা হয়। কৃষি উৎপাদনশীলতা $= \frac{r_1 + r_2 + \ldots\ldots + r_n}{n}$ এখানে r = কোন শস্যের উৎপাদনের হার অনুসারে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রীয় এককের ক্রম। n = শস্যের সংখ্যা।

এই পদ্ধতিতে দেখা যায়, একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে যে শস্যের উৎপাদনের হার সবথেকে বেশী হয়, সেক্ষেত্রে ranking co-efficient -এর মান নিম্ন হয়, যা আবার উচ্চ কৃষি উৎপাদনশীলতাকে নির্দেশ করে। বিপরীত ক্ষেত্রে বিষয়টি একইভাবে প্রযোজ্য হয়।

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো যায়। ধরা যাক, একটি অঞ্চলে 40টি Component areal unit রয়েছে। এর মধ্যে 'x' Component areal unit -এ গড় উৎপাদনের ভিত্তিতে গমের ক্রম 5, ধানের 12, ছোলার 20, তুলার 21, বার্লির 34, চিনির 38, তৈলবীজের 40 এবং সরিষার 54। এদের গড় rank-কে 'x' areal unit-এর ranking co-efficient বলা হবে।

$$\text{তখন 'x' স্থানটির উৎপাদনশীলতা} = \frac{5+12+20+21+34+38+40+54}{8} = \frac{224}{8} = 28$$

এইভাবে 80টি Component areal unit -এর গড় ক্রম বের করে তাকে মানের ঊর্ধ্বক্রমে বা অধঃক্রমে সাজাতে হবে এবং তাকে 5টি সমান ভাগে ভাগ করতে হবে। যেমন — খুব নিম্ন, নিম্ন, মাঝারী, উচ্চ এবং খুব উচ্চ। প্রতিটি Component areal unit -এর কৃষি উৎপাদনশীলতার সূচককে উপরোক্ত অঞ্চলে ভাগ করে তাকে মানচিত্রে স্থাপন করলে কৃষি উৎপাদনশীলতার অঞ্চল নির্ণয় করা যায়। ভারতে Kendall -এর পদ্ধতি প্রয়োগ করে কৃষি উৎপাদনশীলতার যে বিন্যাস গড়ে উঠেছে তা নিম্নে বর্ণনা করা হল (চিত্র নং -19)।

চিত্র নং - 19 ঃ ভারতের কৃষি উৎপাদনশীলতা অঞ্চল

Kendall -এর পদ্ধতি অনুসারে ভারতের কৃষি উৎপাদনশীলতার সূচক (1990-94)

উৎপাদনশীলতার মান	সূচক
অতি উচ্চ কৃষি উৎপাদনশীলতা	<75
উচ্চ কৃষি উৎপাদনশীলতা	<90
মধ্যম কৃষি উৎপাদনশীলতা	<105
নিম্ন কৃষি উৎপাদনশীলতা	<125
খুব নিম্ন কৃষি উৎপাদনশীলতা	>125

ক) **অতি উচ্চ কৃষি উৎপাদনশীলতা যুক্ত অঞ্চল ঃ-** গঙ্গা-শতদ্রু সমভূমির উচ্চ অংশে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং নিম্ন গঙ্গা সমভূমি, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কেরালার উপকূলীয় জেলাগুলি, কাশ্মীর উপত্যকা, ত্রিপুরার পশ্চিম অংশ, মহারাষ্ট্রের কোলহাপুর ও সাংলী জেলা প্রভৃতি স্থানগুলিতে অতি উচ্চ কৃষি উৎপাদনশীলতা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া পাঞ্জাব ও হরিয়ানার অধিকাংশ স্থানে, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের মীরাট ও রোহিলখণ্ডে কৃষি উৎপাদনশীলতার অতি উচ্চ মান পরিলক্ষিত হয়।

এই অঞ্চলে গম, ধান, ইক্ষু এবং তুলা হল প্রধান শস্য। এই অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এখানকার কর্ষিত জমির 90% এর বেশী অংশে খাল বা নলকূপের সাহায্যে সেচকার্য হয়ে থাকে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়, পশ্চিমবঙ্গের কিছু জেলায় এবং উপকূলীয় ওড়িশায় ধান ও পাট হল উল্লেখযোগ্য দুটি ফসল। এখানকার কৃষকেরা তাঁদের ক্ষুদ্র কৃষিজোতে বছরে তিনপ্রকার ধান চাষ করে থাকে। নিম্ন গঙ্গা সমভূমি প্রতি বৎসর বর্ষা ঋতুতে প্লাবিত হয়। প্লাবনে আগত পলি নিম্ন গঙ্গা সমভূমির মৃত্তিকাকে উর্বর করে।

উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, কাবেরী বদ্বীপ এবং তামিলনাড়ু ও কেরালায় উপকূলীয় জেলাগুলিতে প্রধান কৃষিজ ফসল হল ধান। অন্ধ্রপ্রদেশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল হল তামাক। মহারাষ্ট্রের সাংলী, সাঁতারা এবং কোলহাপুর জেলার প্রধান প্রধান ফসলগুলি হল ইক্ষু, গম, পিঁয়াজ এবং আঙুর। কাশ্মীরের অনন্তনাগ ও বারমুলা জেলায় ধান, আপেল,

জাফরান ইত্যাদি হল প্রধান ফসল।

খ) **উচ্চ কৃষি উৎপাদনশীলতা যুক্ত অঞ্চল ঃ-** অতি উচ্চ কৃষি উৎপাদনশীলতা অঞ্চলের আশেপাশেই উচ্চ উৎপাদনশীলতা বলয় গড়ে ওঠে। যেমন — পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, মণিপুর উপত্যকায়, পূর্বঘাট পর্বতের অংশ বিশেষে, কেরালা এবং তামিলনাড়ুতে উচ্চ উৎপাদনশীলতা দেখা যায়। এখানকার প্রধান শস্যগুলি হল গম, ধান ইক্ষু, পাট, তুলা, তৈলবীজ এবং ভুট্টা।

গ) **মধ্যম কৃষি উৎপাদনশীলতা যুক্ত অঞ্চল ঃ-** মধ্যম মানের উৎপাদনশীলতা বিভিন্ন রাজ্যের বিচ্ছিন্ন অংশে যেমন — উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, ওড়িশা এবং তামিলনাড়ুতে দেখা যায়। এই অঞ্চলে শস্য বৈচিত্র্যায়নের প্রবণতা অত্যন্ত বেশী। এখানে জলের প্রয়োজন হয় এমন শস্য (ধান) চাষ থেকে শুরু করে স্বল্প মাত্রায় জলের প্রয়োজনীয় শস্যের (বাজরা, মিলেট) চাষ হয়ে থাকে। এই অঞ্চলে কৃষি প্রণালী জীবিকাসত্ত্বাভিত্তিক প্রকৃতির হয়। কৃষকেরা চিরাচরিত প্রথায় চাষাবাদ করে।

ঘ) **নিম্ন ও (ঙ) খুব নিম্ন কৃষি উৎপাদনশীলতা যুক্ত অঞ্চল ঃ-** উপদ্বীপীয় ভারতের মধ্যভাগের বৃহৎ অংশের কৃষি উৎপাদনশীলতা স্বল্প বা খুবই কম। ছোটনাগপুরের (ঝাড়খণ্ড) জেলাগুলি, রাজস্থানের বারমের ও জয়শালমীর জেলা, জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুর ও ডোডা, গুজরাটের ভাবনগর, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানগুলিতে কৃষি উৎপাদনশীলতা নিম্ন থেকে অতি নিম্ন মানের।

● **Ranking-Co-efficient পদ্ধতির দুর্বলতা ঃ-** কৃষি উৎপাদনশীলতা অঞ্চল নির্ধারণে ranking-co-efficient পদ্ধতি সহজ ও সরল হলেও কয়েকটি ত্রুটি উল্লেখযোগ্য। যেমন—

ক) **শস্যের পর্যায়ক্রম নির্ণয়ে পরিসংখ্যানগত দুর্বলতা ranking-co-efficient** পদ্ধতিতে রয়েছে। একটি উদাহারণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে। ধরা যাক তিনটে জেলা হল A,B ও C। এই তিনটে জেলায় মোট কর্ষিত জমির যথাক্রমে 60%, 59%, ও 20% জমিতে গম চাষ হয়। Ranking -Co-efficient পদ্ধতি অনুযায়ী তাদের ক্রম (Rank) যথাক্রমে 1,2,ও 3। কিন্তু উদাহরণে দেখা যাচ্ছে যে B জেলা অপেক্ষা A জেলায় গম চাষে নিয়োজিত জমির পরিমাণ মাত্র 1% বেশী এবং C জেলায় B অপেক্ষা 39% বেশী জমিতে গম চাষ হয়। অথচ ক্রমের দিক থেকে C জেলা B-এর থেকে মাত্র এক একক মান নীচে অর্থাৎ ক্রমের পার্থক্য মাত্র 1। বিভিন্ন ক্রমের মধ্যে যে পার্থক্য তা ঠিকমত পালন করা হয় না এবং তা কখনো সমতাপূর্ণ (Uniform) নয়।

খ) যেহেতু এই পদ্ধতি গাণিতিক গড়ের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে সে জন্য গাণিতিক গড়ের যে যে অসুবিধা দেখা যায় এই পদ্ধতিরও সেই ত্রুটিগুলি দেখা যাবে। এই পদ্ধতি শস্যের গুণমানকে অস্বীকার করে।